JOURNAL OF ELT AND EDUCATION
ISSN: 2618-1290 (Print), 2663-1482 (Online), Volume 4, Issue 1, March 2021, Page: 15-19
Published by, Hello-Teen Society & Center for Academic Research and Development (CARD)

জমাদান ঃ ১০.১১.২০২০ **গ্রহণ ঃ** ০৫.১২.২০২০ **প্রকাশ ঃ** ২২.০২.২০২১

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পথের পাঁচালী* উপন্যাসে লোকসংস্কৃতি

গবেষণা পত্র

স্বর্ণা দত্ত*

[**উদ্ধৃতি ঃ** দত্ত, স্বর্ণা। ২০২১। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পথের পাঁচালী* উপন্যাসে লোকসংস্কৃতি। *জার্ণাল অব ইএলটি এন্ড এডুকেশন*, ৪(১) ঃ ১৫-১৯]

সারসংক্ষেপ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *পথের পাঁচালী* উপন্যাসে লোকসংস্কৃতিকে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে উপস্থাপন করেছেন। ফলে তা উপন্যাসের শিল্পমানকে বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণে। প্রধান-অপ্রধান চরিত্রের নানা মাত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে লোকসংস্কৃতি ব্যবহৃত হয়েছে। লোকছড়ার মাধ্যমে কখনো অসহায়ত্ব, কখনো লোক বিশ্বাস, কখনো আনন্দ ব্যক্ত হয়েছে। রূপকথা, কিংবদন্তী, ছড়া, মন্ত্র, ব্রত কথা, অলৌকিক ভৌতিক কাহিনি কোনোটিই বাদ যায়নি এ উপন্যাসে। সমালোচকদের আলোচনায় এ উপন্যাসের নানা দিক প্রতিফলিত হলেও লোকসংস্কৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়নি। বর্তমান নিবন্ধে *পথের পাঁচালী* উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান আলোচনার সূত্রে সমাজ বাস্তবতা তুলে ধরার পাশাপাশি লোকজ বিশ্বাস এবং রীতি-নীতি সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

মূলশব্দ ঃ *পথের পাঁচালী*, লোকসংস্কৃতি, লোকজ বিশ্বাস

মানব জাতির আচার-আচরণ, শিক্ষা-দীক্ষা, উন্নতি-অবনতি, মানসিকতা, টানা-পোড়েন এসবের ধারা-সমন্বয়ে সৃষ্ট এক অপূর্ব মনোভাবই হলো সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট রূপই লোকসংস্কৃতি। Folklore শব্দের প্রতিরূপ হিসেবে বাংলায় লোকসংস্কৃতি ব্যবহৃত হয়েছে। লোকসংস্কৃতির প্রতিশব্দ হিসেবে লোকবিজ্ঞান, লোকশ্রুতি, লোকযান, লোকসাহিত্য, লোককৃতি প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে বলেছেন,

> "Folklore is the total creation of the life practice and the idealional pursuit mainly collective spontaneous and anonymous efforts of an integrated society" (ভট্টাচার্য, ১৯৬২)

অর্থাৎ লোকায়ত সংহত সমাজের মূলত সমষ্টিগত জীবনচর্চা ও মানসচর্চার স্বতঃস্ফূর্ত নামাঙ্কহীন সামগ্রিক কৃতি-ই হলো লোকসংস্কৃতি। উপাদান ও উপকরণের দিক দিয়ে বাংলার লোকসংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। সমৃদ্ধ এ লোকসংস্কৃতিকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) তাঁর *পথের পাঁচালী* (১৯২৯) উপন্যাসে তুলে ধরেছেন বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে। গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর মতে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যে "রূপকথার এক স্বপ্নমুগ্ধ অলৌকিক জগৎ রচনা করলেন"(রায়চৌধুরী, ১৯৯৬ ঃ ১৪)। এই অলৌকিক জগৎ নির্মাণ করার জন্য বিভূতিভূষণ লোকসংস্কৃতিকে তাঁর সাহিত্যের অন্যতম উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

পথের পাঁচালী উপন্যাস বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম এবং বহুল আলোচিত-সমালোচিত উপন্যাস। বিভিন্ন সমালোচক উপন্যাসটি সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত তুলে ধরেছেন। গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর মনে করেন, ''*পথের পাঁচালী* সেই নিত্য চলমান জীবনের অধিষ্ঠাত্রী পথিক দেবতার বন্দনা গান" (রায়চৌধুরী, ১৯৯৬ ঃ ৮৮)। তিনি এ উপন্যাসের অসামান্যতার ক্ষেত্রে বলেছেন– "এই প্রতিদিনের অত্যন্ত-চেনা জগৎকে এক অপরিচয়ের রহস্য-আলোয় অনির্বচনীয় ক'রে তোলার মধ্যেই 'পথের পাঁচালী'র সত্যকার অসামান্যতা'' (রায়চৌধুরী, ১৯৯৬ ঃ ৮৪)। কিশলয় ঠাকুরের মতে, "'পথের পাঁচালী' ঠিক যেন অবন ঠাকুরের আঁকা মেটে রঙের ভারতীয় চিত্র" (ঠাকুর ১৯৯৫ ঃ ১৪৮)। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারণা– ''*পথের পাঁচালী*র একমাত্রতা এবং অনন্যতা তার কেন্দ্রীয় চরিত্র নির্বাচনে'' (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০০ ঃ ২৬১)। বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের মতে– "প্রকৃতিচেতনা এই উপন্যাসের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য" (সেন, ১৯৯৭ ঃ ১৫)। নাসরীন আখতারের মনে করেন– "প্রকৃতি, মানুষ ও অধ্যাত্মচিন্তার পাস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া *পথের পাঁচালী*" (আখতার, ২০১৩ ঃ ৬৮)। উক্ত সমালোচকদের আলোচনায় *পথের পাঁচালী* উপন্যাসের নানা দিক প্রতিফলিত হলেও লোকসাহিত্য নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়নি। আলোচ্য নিবন্ধে *পথের পাঁচালী* উপন্যাসে চিত্রিত লোকসংস্কৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ দিকসমূহ তুলে ধরার পাশাপাশি সমাজ বাস্তবতাও তুলে ধরার প্রয়াস থাকবে।

পথের পাঁচালী উপন্যাসে বর্ণিত পুণ্যিপুকুরের ব্রত লোক সংস্কৃতির উপাদান। বাড়ির অবিবাহিত মেয়েরা এ ব্রত পালন করে। *পথের পাঁচালী* উপন্যাসে দুর্গা পুণ্যিপুকুরের ব্রত পালন করে। ব্রতের জন্য- "উঠানে ছোট্ট চৌকোণা গর্ত কাটিয়া তাহার চারিধারে ছোলা, মটর

*Corresponding Email: swarna7datta@gmail.com
প্রভাষক (বাংলা), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ

ছড়াইয়া দিয়াছিল–ভিজে মাটিতে সেগুলির অঙ্কুর বাহির হইয়াছে–চারিদিকে কলার ছোট বোগ পুঁতিয়া ধারে পিটুলি গোলার আলপনা দিতেছে–পদ্মলতা, পাখি, ধানের শীষ, নতুন সূর্য" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৮ ঃ ৩৪)। এছাড়া এ ব্রতে যে ছড়াটি আবৃত্তি করা হয় তা হলো –

"পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা কে পুজে রে দুপুরবেলা?
আমি সতী লীলাবতী ভায়ের বোন্ ভাগ্যবতী–" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৮ ঃ ৩৪)

লোকসংস্কৃতির উপাদান লোকছড়ার ব্যবহারও এ উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়। ইন্দির ঠাক্‌রুন দুর্গাকে ছড়া শোনায়। এক সময় ইন্দির ঠাক্‌রুনের বেশ সুনাম ছিলো ছড়া আবৃত্তিতে।

"ও ললিতে চাঁপকলিতে একটা কথা শুন্‌সে,
রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে–" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৮ ঃ ১১)

এটুকু বলার পর পদ পূরণের জন্য দুর্গাকে বলতে বলে। এরপর বাকি অংশ দুর্গা বলে। এভাবে দুর্গা ও তার পিসির মধ্যে বন্ধন আরো প্রগাঢ় হয়।

সর্বজয়া ও ইন্দির ঠাক্‌রুনের মধ্যে প্রতিনিয়ত ঝগড়া হয়। অসহায় ইন্দির নিজের অবস্থাকে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছে একটি লোকছড়ার মাধ্যমে –

"লাথি ঝাঁটা পায়ের তল,
ভাত কাপড়টাই বুকের বল–" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৮ ঃ ১৮)

খাবার ও থাকার ব্যবস্থা যেখান থেকে হয়; সেখানে বিনা পয়সার থাকতে হলে একটু লাথি ঝাঁটা সহ্য করতে হয়। কৌলিন্য প্রথার যাতাকলে পিষ্ট ইন্দির ঠাক্‌রুনের অসহায়ত্বকে এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

সর্বজয়া দেড় বছরের অপুকে ঘুম পাড়ানোর জন্য ছড়া বলতো। যেমন–

"আয় রে পাখি-ই-ই লেজঝোলা,
আমার খোকনকে নিয়ে–এ–এ–গাছে তোলা..." (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৮ ঃ ৩৬)

কালবৈশাখী ঝড়ে অপু আর দুর্গা আম কুড়োতে গেলে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ দেখা না গেলে অপু ভয় পেয়ে যায়। তখন দুর্গা তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য একটি লোকছড়া আবৃত্তি করে এবং অপুকে জানায় এ ছড়া আবৃত্তি করলে বৃষ্টি থেমে যাবে। লোকবিশ্বাস থেকেই সে ছড়াটি আবৃত্তি করে–

"নেবুর পাতায় করম্‌চা, হে বিষ্টি ধরে যা–" (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৮ ঃ ৩৯)

এছাড়া দুর্গার মা তাকে গন্ধভেদালির পাতা আনতে বললে সে মনের আনন্দে মাথা দুলিয়ে সুখে ছড়া বলে–

"হলুদ বনে বনে
নাক-ছাবিটি হারিয়ে গেছে সুখ নেইকো মনে–" (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৮ ঃ ৮১)

রাণুর দিদি লীলার বিয়েতে বালুচরের শাড়ি আনা হয়েছে শুনে দুর্গা তার পিসি ইন্দির ঠাক্‌রুনের মুখে শোনা একটি ছড়া বলে –

"বালুচরের বালুর চরে একটা কথা কই –
মোষের পেটে ময়ূরছানা দেখে এলাম সই" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৮ ঃ ৭১)

নীলপূজার দিন রাতে সন্ন্যাসীরা যে ছড়া বলতে বলতে মড়ার মুণ্ড নিয়ে আসে সে ছড়া দুর্গা জানে। সে বলে –

"স্বগগো থেকে এলো রথ
নামলো খেতুতলে
চব্বিশ কুটী বাণবর্ষা শিবের সঙ্গে চলে–
সত্যযুগের মড়া আর আওল যুগের মাটি
শিব শিব বলরে ভাই ঢাকে দ্যাও কাঠি–" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৮ ঃ ৭৯)

উপন্যাসটিতে নীতি নির্দেশমূলক ছড়াও আছে। যেমন–

"মুনির চিন্তা চিন্তামণি নাই অন্য আশা
নিষ্কর্মা লোকের চিন্তা তাস আর পাশা।
ধনীর চিন্তা ধন আর নিরেনব্বইএর ধাক্কা,
যোগীর চিন্তা জগন্নাথ, ফকিরের চিন্তা মক্কা,
গৃহস্থের চিন্তা বজায় রাখতে চারি চালের ঠাট্‌টা,
শিশুর চিন্তা সদাই মাকে, পশুর চিন্তা পেট্‌টা।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৮ ঃ ১২৭)

মন্ত্র লোকসংস্কৃতির অঙ্গ। *পথের পাঁচালী* উপন্যাসে মন্ত্রের নানাবিধ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন– "কোন্ দেশে সান্ন্যাল মহাশয় একজন ফকিরকে দেখিয়াছিলেন, সে এক অশত্থতলায় থাকিত। এক ছিলিম গাঁজা পাইলে সে খুশি হইয়া বলিত–আচ্ছা কোন ফল তোমরা খাইতে চাও বল। পরে ইপ্সিত ফলের নাম করিলে সে সম্মুখের যে কোনো একটা গাছ দেখাইয়া বলিত–যাও, ওখানে গিয়া লইয়া আইস। লোকে গিয়া দেখিত হয়তো আমগাছে বেদানা ফলিয়া আছে কিংবা পেয়ারা গাছে কলার কাঁদি ঝুলিয়া আছে" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৮ ঃ ৪৩)। এ উপন্যাসে রাজু রায়ের মাধ্যমে মন্ত্র ব্যবহারের আরো একটি ঘটনা জানা যায়। "একবার–অনেক কালের কথা–আমার তখন সবে

হয়েচে উনিশ-কুড়ি বয়েস, চাকদা থেকে গঙ্গাচান করে গোরুর গাড়ি করে ফিরছি। বুধো গাড়োয়ানের গাড়ি–গাড়িতে আমি, আমার খুড়িমা, আর অনন্ত মুখুয্যের ভাইপো রাম, যে আজকাল উঠে গিয়ে খুলনায় বাস করছে। কানসোনার মাঠের কাছে প্রায় বেলা গেল। তখন ওসব দিকে কি রকম ভয়ভীতি ছিল, তা রাজকৃষ্ট ভায়া জানো নিশ্চয়। একে মাঠেররাস্তা, সঙ্গে মেয়েমানুষের দল, কিছু টাকাকড়িও আছে–বড্ডভাবনা হোলো! আজকাল যেখানে নতুন গাঁ-খানা বসেচে–ওই বরাবর এসে হোলে কি জানো? জন-চারেক ষণ্ডামাক্কোগোছের মিশকালো লোক এসে গাড়ির পেছন দিকের বাঁশ দুদিক থেকে ধল্লে। এদিকে দুজন, ওদিকে দুজন। দেখে তো মশাই আমার মুখে আর রা-টা নেই, কোনোরকমে গাড়ির মধ্যে বসে আছি, এদিকে তারাও গাড়ির বাঁশ ধরে সঙ্গেই আসচে, সঙ্গেই আসচে। বুধো গাড়োয়ান দেখি পিট্ পিট্ করে পেছন দিকে চাইচে। ইশারা করে আমাদের কথা বলতে বারণ করে দিলে। বেশ আছে! এদিকে গাড়ি একেবারে নবাবগঞ্জ থানার কাছাকাছি এসে পড়ল। বাজার দেখা যাচ্চে, তখন সেই লোক ক'জন বল্লে–ওস্তাদজী, আমাদের ঘাট হয়েচে, আমরা বুঝতে পারি নি, ছেড়ে দাও। বুধো গাড়োয়ান বল্লে–সে হবে না ব্যাটারা। আজ সব থানায় নিয়ে গিয়ে বাঁধিয়ে দোব। অনেক কাকুতি-মিনতির পর বুধো বল্লে–আচ্ছা যা, ছেড়ে দিলাম এবার, কিন্তু কক্ষনো এরকম আর করিস্ নি! তবে তারা বুধো গাড়োয়ানের পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেল। আমার স্বচক্ষে দেখা। মন্তরের চোটে ওই যে ওরা বশ্যি এসে ধরেচে, অমনি ধরেই রয়েচে–আর ছাড়াবার সাধ্যি নেই–চলেছে গাড়ির সঙ্গে! একবারে পেরেক-আঁটা হয়ে গিয়েছে" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৮ ঃ ৪৩)।

কলুইচণ্ডীর ব্রতের উল্লেখ আছে *পথের পাঁচালী* উপন্যাসে। এ ব্রতের দিন গ্রামের উত্তর মাঠে মজা পুকুরের ধারে বনভোজন করে গ্রামের মহিলারা সবাই মিলে। অপুর মা সর্বজয়াও এ ব্রত পালনের জন্য সেখানে যায়। কিন্তু ছেলে-মেয়েকে সঙ্গে নেয় না। কেননা, ঐ দিন নিজের খাবার জিনিস নিজেদের নিয়ে যেতে হয়। একে তো অপুদের এত চাল-ডাল নেই তার উপর ভুবন মুখুয্যের বাড়ির ছেলে-মেয়েরা ভালো ভালো খবার খায়। নিজের সন্তানদের ভালো খাবার খাওয়াতে পারে না বলে সর্বজয়ার মন খারাপ হয় তাই সে একাই এ ব্রত পালন করেন। খাবার পরিবেশনের মধ্য দিয়েও এ উপন্যাসে ধনী-গরিবের অবস্থানকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

গ্রামের মানুষ সুদর্শন পোকা দর্শনকে ভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে করে। এ উপন্যাসে দুর্গা সুদর্শন পোকা দর্শন করে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করেছে। লোকায়ত বিশ্বাস অনুযায়ী দুর্গা সুদর্শন পোকা দেখে সন্তর্পণে ধুলার উপর বসে পড়ে এবং হাত কপালে ঠেকিয়ে দ্রুতবেগে আবৃত্তি করে – "সুদর্শন, সুভালাভালি রেখো ... সুদর্শন, সুভালাভালি রেখো... "সুদর্শন, সুভালাভালি রেখো (অবিকল এই রূপই সে অপরের মুখে বলিতে শুনিয়াছে)। পরে সে নিজেই কিছু কথা মন্ত্রের মধ্যে জুড়িয়া দিল– অপুকে ভালো রেখো, মাকে ভালো রেখো, ওপাড়ার খুড়িমাকে ভালো রেখো– পরে একটু ভাবিয়া ইতস্তত করিয়া বলিল– নীরেনবাবুকে ভালো রেখো, আমার বিয়ে যেন ওখানেই হয় সুদর্শন, রাণুর দিদির মতো বাজি-বাজনা হয়" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৮ ঃ ৬৯)।

চড়ুইভাতি গ্রামীণ লোকজীবনের অন্যতম উপাদান। *পথের পাঁচালী* উপন্যাসে দুর্গা ও অপু সর্বজয়াকে লুকিয়ে চড়ুইভাতি করতে যায়। তারা নীলমণি রায়ের ভিটার পাশে জঙ্গলাকীর্ণ খানিকটা বন পরিষ্কার করে চড়ুইভাতির আয়োজন করে। সর্বজয়ার অনুপস্থিতিতে অপু আর দুর্গা ভাঁড়ার থেকে চাল এবং তেল সংগ্রহ করে চড়ুইভাতি করতে নিয়ে যায়। তারপর কাঠ সংগ্রহ করে রান্নার জন্য। প্রতিবেশী বিনি এলে তাকেও সাথে নিয়ে তারা রান্নার আয়োজন করে। আয়োজন অতি সামান্য; ভাত আর বেগুন ভাজা। দুর্গা জীবনের প্রথম ভাত ও বেগুন ভাজি রান্না করে খুব খুশি। মাত্র দুটি উপাদান দিয়েই তিনজন মনের সুখে তৃপ্তি সহকারে খাবার খায়।

চড়কপূজা এবং নীলপূজা লোকসংস্কৃতির উপাদান। বাড়ি বাড়ি গিয়ে চড়কপূজার জন্য চাঁদা চাওয়া হয়। অপুর বাবা হরিহরের কাছেও চাঁদা চায়। গাজনের সন্ন্যাসী বাড়ি বাড়ি নাচতে বের হয় এবং দশ বারো দিন নাচে। এরপর চড়কের পূর্বরাত্রে নীলপূজা হয়। খেজুরের ডাল দিয়ে নীলপুজার মণ্ডপ ঘেরা হয়। লোকজ বিশ্বাস অনুসারে, নীলপুজার দিন রাতে শিব দলবল নিয়ে বের হন। ঐদিন যে গন্ধ পাওয়া যায় তা শিবের দলবলের গন্ধ বলে মনে করা হয়। নীলপূজার দিন রাতে সন্ন্যাসীরা শ্মশান জাগাতে যায়। একজন মরা হয়। তাকে বেঁধে শ্মশানের ছাতিমতলায় নিয়ে যাওয়া হয়। তাকে আবার বাঁচায়। তারপর ছড়া বলতে বলতে মড়ার মুণ্ড নিয়ে আসে। চড়কের মেলা বাংলার লোকসংস্কৃতির উল্লেখ্যযোগ্য উপাদান। চড়কপূজা উপলক্ষে মেলা বসে গ্রামে। নিশ্চিন্দিপুর গ্রামেও চড়কের মেলা বসে। সেখানে রকমারি জিনিস থেকে শুরু করে সবকিছু পাওয়া যায়। বাঁশের বাঁশি, তেলে ভাজা দোকানও বসে মেলায়। অপু মেলা থেকে বাঁশের বাঁশি কিনে। মেলা থেকে বাঁশি, শোলার পুতুল, কাঠের পুতুল, রঙিন কাগজের পাখা, রং-করা হাঁড়ি, ছোবা প্রভৃতি নানা জিনিস নিয়ে লোকজন বাড়ি ফিরে যায়।

যাত্রা লোকসংস্কৃতির অঙ্গ। এ উপন্যাসে চড়ক উপলক্ষে গ্রামের বারোয়ারিতলায় যাত্রা পালার আয়োজন করা হয়। দূর থেকে বায়না করে যাত্রাদল নিয়ে আসা হয় নিশ্চিন্দিপুরে। গ্রামের সবাই যাত্রা পালার কাহিনি এবং অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। গ্রামসুদ্ধ সবার মুখে যাত্রা ছাড়া আর কোনো কথা শোনা যায়নি কয়েকদিন। অপুও যাত্রা পালা দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। যাত্রা পালার রাজপুত্র হিসেবে সে নিজেকে আর রাজকন্যা হিসেবে দিদিকে কল্পনা করে। যাত্রা দলের অজয়ের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

লোকসংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান গ্রামীণ খেলা। গঙ্গা-যমুনা খেলা, কড়ি খেলা, দোকানের পসরা সাজানো, চড়ুইভাতি খেলা প্রভৃতি গ্রামীণ খেলার মধ্যে অন্যতম। উপন্যাসটিতে গঙ্গা-যমুনা খেলার জন্য দুর্গাকে খাপ্‌রা সংগ্রহ করতে দেখা যায়। ছেলেদের খেলার মধ্যে কড়ি খেলা অন্যতম। কড়ি খেলা সূত্রেই পটুর সঙ্গে অপুর বন্ধুত্ব হয়। কড়ি খেলার চমৎকার বর্ণনা রয়েছে উপন্যাসে। দোকানের পসরা সাজানো খেলা খেলতে অপু আর দুর্গাকে দেখা যায়। প্রথমে দুজনে ইট দিয়ে বড় দোকানঘর বশ্যিলো। তারপর– "দুজনে মিলিয়া নোনা পাতার পান, মেটে আলু, ফলের আলু, রাধালতা ফুলের মাছ, তেলাকুচির পটল, চিচ্চিড়ের বরবটি, মাটির ঢেলার সৈন্ধব লবণ– আরো কত কি সংগ্রহ করিয়া আসিয়া দোকান সাজাইতে বড় বেলা করিয়া ফেলিল।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৮ ঃ ৫৫)। তারপর সতু এসে ওদের সঙ্গে খেলায় যোগ দেয় এবং জিনিসপত্র কেনা-বেচা করে। এছাড়া অপু ও দুর্গা চড়ুইভাতি খেলাও খেলে থাকে। সে খেলায় খাবারগুলো সত্যি খাবার থাকে না।

রূপকথা বা গল্প বলা গ্রামীণ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এ উপন্যাসে ইন্দির ঠাক্‌রুন দুর্গকে রূপকথার গল্প শোনাতো। সন্ধ্যার সময় দুর্গা তার কাছে বসে গল্প শুনতো। "খানিকক্ষণ এ গল্প ও গল্প শুনিবার পর খুকি বলে, – পিতি, সেই ডাকাতের গল্পটা বল্ তো! গ্রামের একঘর গৃহস্ত বাড়িতে পঞ্চাশ বছর আগে ডাকাতি হইয়াছিল, সেই গল্প।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৮ ঃ ১১)। অপুর মা সর্বজয়া তার সন্তানদের কখনো শ্যামলঙ্কার গল্প, কখনো রাজপুত্রের গল্প শোনাতো। আবার পটলির ঠাকুমা সন্ধ্যার সময় ছেলেমেয়েদের নিয়ে হাওয়ায় বসে গল্প বলেন। পটলির ঠাকুমার গল্প বলার মধ্য দিয়ে লেখক তখনকার লোকজীবনকে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। সর্বজয়া কখনো কখনো কাশীদাসী *রামায়ণ* পাঠ করতো। *অন্নদামঙ্গল* থেকে গল্প পড়ে শোনাত। অপু হরিহরের গল্প শুনতে চাইলে সর্বজয়া সুর করে পাঠ করে–

"রাজা বলে শুন শুন মুনির নন্দন।
কহিব অপূর্ব কথা না যায় বর্ণন–
সোমদত্ত নামে রাজা সিন্ধুদেশে ঘর।
দেবদ্বিজে হিংসা সদা অতি–" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৮ ঃ ২৭)

সাধারণত কোনো কিছু পাওয়ার আশায় অথবা আরোগ্য লাভের আশায় মানত করা হয়। *পথের পাঁচালী* উপন্যাসে সর্বজয়াও গঙ্গানন্দপুরের সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরবাড়িতে পূজা দেয়ার মানত করে। কিন্তু নিশ্চিন্দিপুর থেকে তিন ক্রোশ দূরে বলে সে মানত আর পূরণ করতে পারেনি। তাই নিশ্চিন্দিপুর থেকে চলে যাওয়ার আগে সর্বজয়ার মানত পূরণ করতে অপু সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে গিয়ে পূজা দিয়ে আসে। সেখানে বহু মানুষের সমাগম হয় পূজা দেয়ার জন্য। তাছাড়া অপুর জন্মের পর পীরির দরগায় সিন্নি দেওয়ার বিষয়টিও সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরা হয়েছে। রামনবমীর দোল নিশ্চিন্দিপুরে আনন্দের বার্তা বয়ে নিয়ে আসে। চৈত্র-বৈশাখ মাসে এ দোল হয়। ঐ দিন গাঙ্গুলি বাড়িতে সবাই নিমন্ত্রণ খায়। দোলের দিন সবাই পেট ভরে ঘিয়ে ভাজা লুচির সাথে হরেক রকম খাবার খেয়ে থাকে। এ উপন্যাসে কিছু কিংবদন্তীও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- বিশালাক্ষী দেবীর কাহিনি, ঠ্যাঙাড়েদের নিয়ে কাহিনি। এছাড়া মধুসংক্রান্তির ব্রত, স্নানযাত্রা, মনসার ভাসান প্রভৃতিরও উল্লেখ আছে উপন্যাসে।

ইন্দির ঠাক্‌রুন চরিত্রের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজ বাস্তবতায় কৌলীন্য প্রথার ভয়াবহ রূপ ব্যক্ত হয়েছে। পূর্ব দেশীয় একজন অভিজাত কুলীনের সঙ্গে তার বিবাহ হলেও বিয়ের পর সে পিত্রালয়েই অবস্থান করেছে। বাবা-মা বেঁচে থাকতে তার শখ পূরণের চেষ্টা করেছে। কিন্তু বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর ইন্দির প্রথমে ভাইয়ের সংসারে এবং ভাইয়ের মৃত্যুর পর চিরস্থায়ীভাবে হরিহরের বাবা রামচাঁদের সংসারে আশ্রয় নেয়। হরিহরের সংসারে অযাচিতভাবে অবস্থান করার জন্য প্রতিনিয়ত তাকে কটু বাক্য শুনতে হয়েছে। বিয়ের পর মাত্র তিনবার দেখেছে সে স্বামীকে। তার স্বামী শ্বশুর বাড়িতে এসে এক-আধ দিন অবস্থান করে পথের খরচ ও কৌলীন্য-সম্মান আদায় করে পরবর্তী শ্বশুর বাড়িতে চলে যেতো। তাই – "স্বামীকে ইন্দির ঠাক্‌রুন ভালো মনে করিতেই পারে না" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৮ ঃ ১০)। শ্বশুর বাড়িতে থেকে আসা পত্রের মাধ্যমে সে জানতে পারে তার স্বামী মারা গেছে। বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলিন্য প্রথার বিষবাষ্প কীভাবে সমাজকে বিষিয়ে তুলেছিলো তা স্বল্প পরিসরে ইন্দির ঠাকরুন চরিত্রের মধ্য গিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

জন্মান্তরে বিশ্বাস থেকে ইন্দির এবং অন্যান্যরা মনে করে বিশ্বেশ্বরী দুর্গা রূপে পুনরায় তার মায়ের কাছে ফিরে এসেছে। লৌকিক বিশ্বাস অনুযায়ী মৃত আত্মা বিশেষত অতৃপ্ত আত্মা জাগতিক টানে চেনা জায়গায় আপনজনের কাছে অন্যদেহের মধ্য দিয়ে ফিরে আসে।
"নেও ঠাকুরঝি, ও তোমার আর-জন্মে মেয়ে ছিল, সেই মেয়েই আবার তোমার ফিরে এসেছে–" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৮ ঃ ১৪)। এছাড়া লোকবিশ্বাস থেকেই ইন্দির ঠক্‌রুনেরও মনে এ চিন্তার উদয় হয়– "হরিহরের মেয়ের মধ্যে বিশ্বেশ্বরী মৃত্যুপারের দেশ হইতে চল্লিশ বছর পরে তাহার অনাথা মায়ের কোলে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে " (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৮ ঃ ১০)।

ডাইনী বিশ্বাসও গ্রামীণ বাস্তবতায় পরিলক্ষিত হয়। গ্রামের কোনো অসহায় নিঃস্ব, নিঃসন্তান বুড়িকে ডাইনী আখ্যা দেয়া হতো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভয় দেখানো হতো ডাইনী বুড়ির কথা বলে। এরূপ বাস্তবতার দেখা মেলে পথের পাঁচালী উপন্যাসে। গ্রামের এক প্রান্তে একজন বুড়ি বাস করতো; যাকে সবাই আতুরী ডাইনী বলতো। অপু আর নীলু একবার পথ হারিয়ে আতুরী ডাইনীর বাড়ি চলে আসে। ওরা আতুরী ডাইনীকে দেখে প্রচণ্ড ভয় পায় এবং সেখান থেকে পালাতে চায়। আসলে আতুরী ডাইনী বলে কিছু নাই। এটি একটি লোকবিশ্বাস। এ বিশ্বাসের ফলে অনেক নিরীহ বুড়িকে প্রাণ দিতে হয়েছে জনগণের হাতে।
দুপুরবেলা কেউ না খেয়ে চলে গেলে গেরস্তের অকল্যাণ হয়। ইন্দির ঠাক্‌রুন বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার সময় এ লোকবিশ্বাস থেকেই সর্বজয়া তাকে খেয়ে যেতে বলে। তার ভাষায় – "তা যাবে যাও, গেরস্তের অকল্যাণ করে যাওয়া কেন? ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি, এতকাল যার খেলে তার একটা মঙ্গল তো দেখতে হয়, অনত্থ সময়ে না খেয়ে চলে গিয়ে তারপর গেরস্তর একটা অকল্যাণ বাধুক, এই তোমার ইচ্ছে তো" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৮ ঃ ১৯)?

গাবগাছকে ভয় পাওয়া লোকজীবনেরই উপাদান এবং লোকবিশ্বাসেরই অঙ্গ। উপন্যাসে দুর্গাকে খুঁজতে গিয়ে অপুর বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। সন্ধ্যাবেলা সে যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল সেখানে একটি গাব গাছ আছে। সেই গাছের ভয়ে অপু ঐ রাস্তা দিয়ে না গিয়ে অন্যপথে বাড়ি আসে। জ্বর হলে কুল খাওয়া নিষেধ লোক এই বিশ্বাসটিকে কাজে লাগিয়েছেন লেখক। অপরু জ্বর হলে তার মা তাকে কুল খেতে নিষেধ করে। তার জন্য আচার তৈরি করে দেবে বলে জানায়।

অলৌকিক ভৌতিক কাহিনিরও উল্লেখ আছে *পথের পাঁচালী* উপন্যাসে। নবীন পালিত হরিহরকে বঁয়শার বিলে মাছ ধরতে যাওয়ার কথা বলে। সেখানে প্রচুর মাছ পাওয়া গেলেও অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। নবীন পালিত জানায়– "শুন্‌লাম, একদিন শেষরাত্তিরে নাকি বিলের একেবারে মধ্যিখানে অথৈ জলে সাঁ সাঁ করে ঠিক যেন বক্‌না বাছুরের ডাক– বুঝ্‌লে? সকলে একসঙ্গে আগাইয়া আসিয়া নবীন পালিতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। –অনেক -কেলে পুরোনো বিল, গহিন জল, দেখেছো তো মধ্যিখানে জল যেন কালো শিউগোলা, পদ্মগাছের

জঙ্গল, কেউ বলে রাঘব বোয়াল, কেউ বলে যক্ষি– যতক্ষণ ফর্সা না হোলো ততক্ষণ তো মশাই নৌকোর ওপরে সকলে বসে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে লাগলো–" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৮ ঃ ২২)।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পথের পাঁচালী* উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির প্রভাব অপরিসীম। তিনি এ উপন্যাসে বাংলার লোকায়ত জীবন, ধর্ম, বিশ্বাস, রীতি-নীতি, সংস্কার প্রভৃতিকে তুলে ধরেছেন বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে। লোকসংস্কৃতির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমেই *পথের পাঁচালী* উপন্যাসটি অতুলনীয় হয়েছে এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। লেখক তাঁর প্রথম উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির বহুল ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মূলত লোকসংস্কৃতির প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

আখতার, নাসরীন। ২০১৩। *বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্করের উপন্যাসে অন্ত্যজ নারীচরিত্রের রূপায়ণ*, প্রথম প্রকাশ, ধ্রুবপদ, ঢাকা।

ঠাকুর, কিশলয়। ১৯৯৫। *পথের কবি*, তৃতীয় মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ১৯১৩। *রবীন্দ্র রচনাবলী* (ত্রয়োদশ খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। ২০০৮। *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়*, সালমা বুক ডিপো, সালমা নতুন সংস্করণ, ঢাকা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। ২০০০। *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, চতুর্থ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

ভট্টাচার্য, ড. আশুতোষ। ১৯৬২। *বাংলার লোক সাহিত্য*, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা।

রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ। ১৯৯৬। *বিভূতিভূষণঃ মন ও শিল্প*, তৃতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ।

সেন, অরুণ [সম্পা.]। ১৯৯৭। *বিভূতিভূষণ ঃ আধুনিক জিজ্ঞাসা*, প্রথম প্রকাশ, সাহিত্য অকাদেমি, কলিকাতা।